নগর সভ্যতার উত্থান-পতন: দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষের জীবন, অর্থনীতি ও পরিচয়ের রূপান্তর

বিভিন্ন স্থানে সমাজ, জীবন ও বসতির ভিন্নতা আর সম্পর্ক

দক্ষিণ এশিয়া বলতে আমরা এখন ভারতীয় উপমহাদেশকেই বুঝে থাকি। তোমরা পিরামিডের কথা পড়েছ, উর নগরের নাম পড়েছ, গ্রিক ও রোমান বিভিন্ন নগর, স্থাপত্য ও সমাজের কথা পড়েছ। একটা সময় পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, ভারত উপমহাদেশের মানুষ অতীতে মেসোপটেমিয়া, মিসর কিংবা গ্রিক ও রোমানদের মতন বড় বড় শহর তৈরি করতে পারে নি। পরিকল্পনা করে রাস্তা ঘাট, মানুষের থাকার জন্য পাকা বাড়ি, দালান-কোঠা, শহর ঘেরা উঁচু দেয়াল তৈরি করার মতন সামর্থ্য ভারত উপমহাদেশর মানুষ অর্জন করতে পারে নি। এমন একটা ধারণা ছিল। সেই ধারণা বদলে গিয়েছিল ১৯২০-এর দশকে। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে বর্তমান পাকিস্তানে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এমন দুটি স্থান খনন করলেন যেখানে পরিকল্পিতভাবে তৈরি রাস্তা, বাড়িঘর, স্নানাগার, গোলাঘরসহ অনেক স্থাপনা খুঁজে পাওয়া গেল। আলাদা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা অংশ আর প্রাচীরের বাইরের একটা অংশ মিলিয়ে বিরাট দুটো নগরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করলেন প্রত্নতত্ত্ববিদগণ। এই নগর দুটি হলো: মহেনজোদারো আর হরপ্পা।

তারপরে একই সময়ের আরও অনেক এমন নগরের ধ্বংসাবশেষ ধীরে ধীরে বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকের গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব আর পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে খুঁজে পাওয়া গেল। এখনও অনেক নতুন নতুন এমন স্থান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। হরপ্পা-মহেনজোদারোসহ অনেকগুলো এমন স্থান সিন্ধু নদী অববাহিকায় অবস্থিত। এজন্য এই সভ্যতার নাম হলো সিন্ধু সভ্যতা। আবার প্রথম আবিষ্কৃত প্রত্নস্থানের নাম অনুসারে কেউ কেউ এই সভ্যতাকে হরপ্পা সভ্যতাও বলে থাকেন। পরে দেখা গেল সিন্ধু নদীর অববাহিকার বাইরেও বিশাল এক অঞ্চলজুড়ে এই সভ্যতার নানা নগর, ছোট ছোট বসতি, গ্রাম-ধরনের বসতি, বাণিজ্যকেন্দ্র, বন্দর, নানা শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রথম দিকের গবেষকগণ বললেন, এই নতুন আবিষ্কৃত সভ্যতার নগরগুলোর পত্তন হয়েছে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে। পরের নানা গবেষণায় দেখা গেল যে, অনেক বসতি আস্তে আস্তে গ্রাম বা কৃষিকেন্দ্রিক কেন্দ্র থেকে রূপান্তরিত হতে হতে ধীরে ধীরে বড় বড় নগরের বিকাশ হয়েছে। তাই হরপ্পা সভ্যতার সময়কালকে কয়েকটি পর্বে বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

আরও দুটো বিষয় তোমরা জানলে মজা পাবে:

এক. হরপ্পা সভ্যতার বসতিগুলো (নগর ও অন্যান্য ধরনের বসতি) বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত। ভারতের মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে উত্তর প্রদেশ অব্দি, কাশ্মীরের পাহাড়ি এলাকায়, আরব সাগরের উপকূলে, আফগানিস্তানের শুষ্ক এলাকায়, রাজস্থানের মরুভূমিতে, পাকিস্তানের বেলুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শুষ্ক, পাহাড়ি ও নদী থেকে দূরের ভূপ্রাকৃতিক এলাকা। বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপে, পরিবেশে, জলবায়ুতে এই সভ্যতার বিভিন্ন ধরনের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তাই হরপ্পা সভ্যতাকে কেবল নদী প্রভাবিত সভ্যতা বলা ঠিক হবে না। যদিও নদী বিধৌত সমতলভূমিতে যে নব্যপ্রস্তরযুগীয় এবং হরপ্পা-সভ্যতার আগের বসতিগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলো এই সভ্যতার পত্তনে ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সমভূমি বা সমতলভূমি

সুবিস্তৃত মৃদু ঢাল যুক্ত সমতল ভূভাগকেই সমভূমি বা সমতলভূমি বলে। মোট স্থলভাগের ৫৩% হলো সমভূমি। সমভূমিতে কৃষিকাজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সবচেয়ে উপযোগী পরিবেশ গড়ে ওঠে বলে সমভূমিতেই সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে।

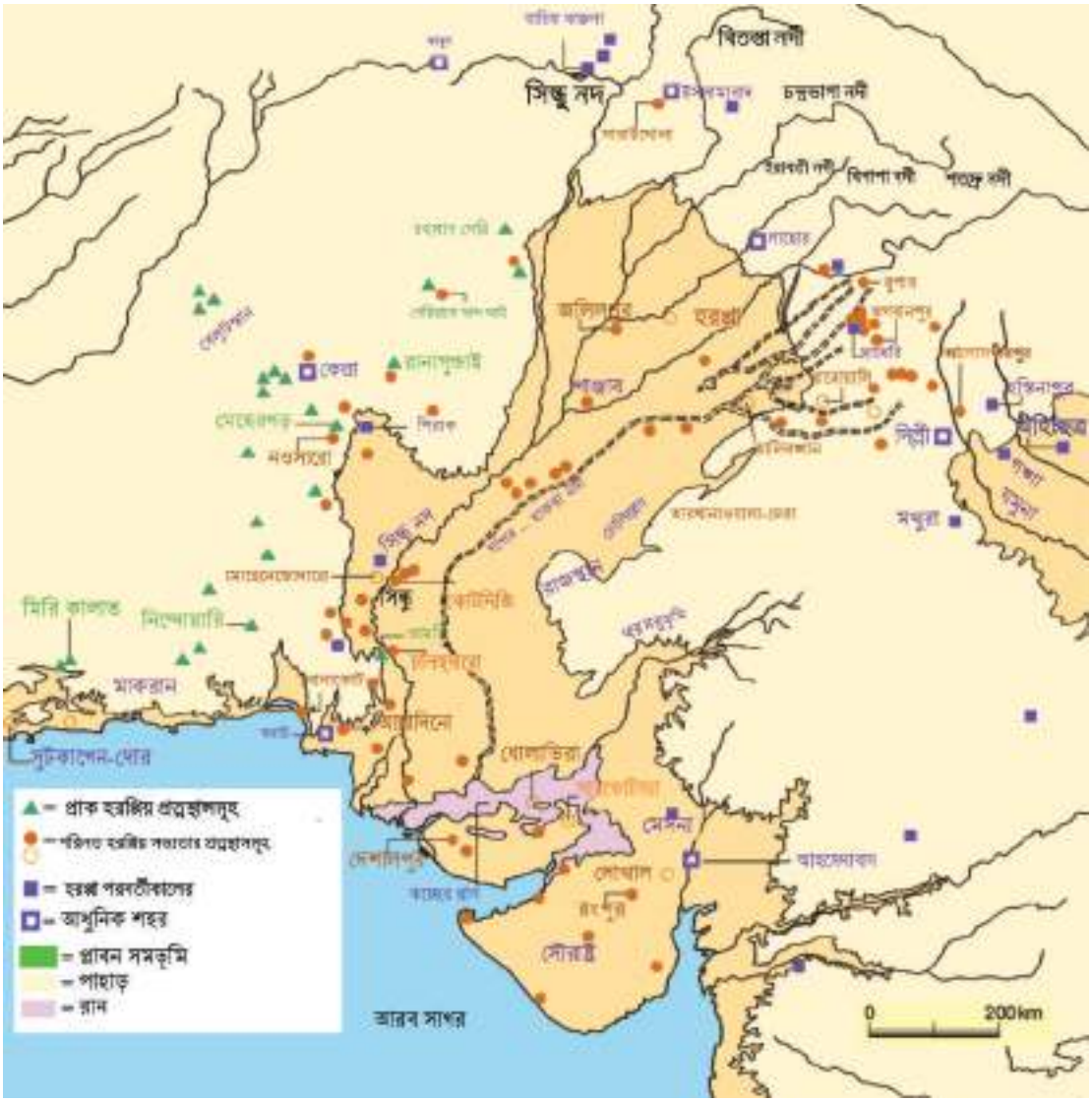

হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগরকেন্দ্র ও বসতি বিশাল একটি এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু নদী অববাহিকা ছাড়া ও, ঘাঘর-হাকরা নামের আরেকটি নদীর অববাহিকাজুড়ে বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ আর পাকিস্তানের পূর্বাংশ মিলে যে-অঞ্চল, সেখানে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। আফগানিস্তানেও এই সভ্যতার কেন্দ্রের উপস্থিতি ছিল। এই মানচিত্রে ওই অঞ্চলের হরপ্পা সভ্যতার প্রধান নগরকেন্দ্রগুলো আর প্রথমদিকের কৃষিভিত্তিক বসতিগুলো দেখানো হয়েছে।

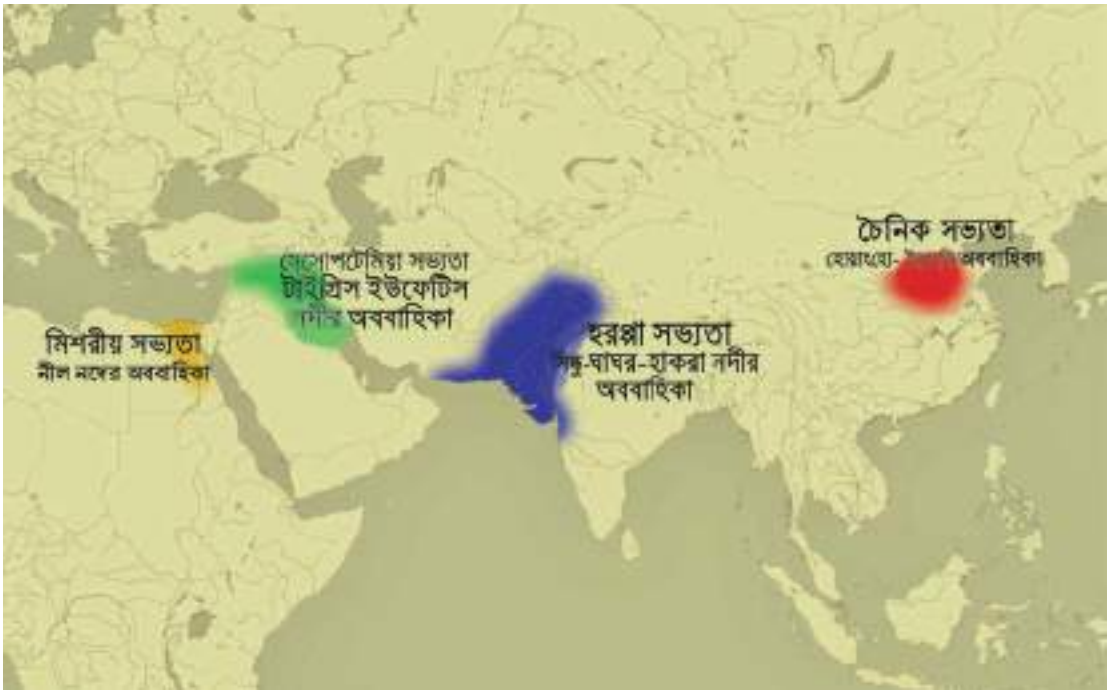

হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সমসাময়িক নীল নদের অববাহিকায় বিকশিত মিসরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় মেসোপটেমীয় সভ্যতা, চীনের হোয়াং হো নদীর অববাহিকার সভ্যতার দূরত্ব ও বিস্তার বোঝার জন্য মানচিত্র।

কিন্তু কেবল চাষাবাদ করে ফলানো ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে বড় বড় নগর বা শহর তৈরি করা হয় নি। অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদনসহ আরও নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজ এই সভ্যতার বিকাশে ভূমিকা রেখেছিল। এই সভ্যতার বিভিন্ন বসতির বিরাট অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃতি হওয়ার পরিস্থিতি ও কারণ তৈরি করেছিল।

দুই. আগেও আমরা জেনেছি যে, মানুষ ও মানব সমাজের অবস্থা বিভিন্ন স্থান ও কালে বিভিন্ন হয়। যখন ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাংশে হরপ্পা সভ্যতার নগর, মানুষ, সমাজ, জীবন বিরাজ করছে, তখনই ভারত উপমহাদেশের উত্তরে, দক্ষিণে এবং পূর্ব দিকে মানুষজন ভিন্ন ধরনের জীবন যাপন করছে। ভিন্ন সমাজ ও আচার আচরণ অনুসরণ করছেন। অন্য উৎপাদন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কোথাও তখন নব্যপ্রস্তরযুগীয়, কোথাও তাম্রপ্রস্তরযুগীয়, কোথাও তখন মিশ্র উৎপাদন পদ্ধতি, সামাজিক গঠন আর বসতির ধরন বিরাজমান ছিল। মানুষে মানুষের সম্পর্কও ভিন্ন ছিল। মানুষ তখন সেসব স্থানে নগর তৈরি করে নি। গ্রাম ছিল। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত বসতি ছিল। একেক স্থানের পরিবেশ, ভূপ্রকৃতি, খাদ্য উৎসের উপস্থিতি অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রাম বা বসতিগুলো ঘরবাড়ি, গবাদিপশু রাখার স্থান, কৃষিজমি বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করার জায়গা নির্ধারিত হতো। তাহলে মনে রেখো, ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে আনুমানিক এখন থেকে ৪ হাজার ৫০০ থেকে ৫০০০ বছর আগে বসতির ধরন, জীবনযাপনের ধরন, খাদ্যাভ্যাসের ধরন, ঘরবাড়ির ধরন একরকম ছিল। মানুষজন পরিকল্পিত নগরে বসবাস করত। আবার, তখন ভারত উপমহাদেশের পূর্বদিকে, যেমন আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে সমাজ, বসতি, উৎপাদন, অর্থনীতি আলাদা ছিল।

ভারত উপমহাদেশে সভ্যতার পত্তন

ইতিহাসে দেখা যায় সভ্যতার যেমন উত্থান ও বিকাশ ঘটে তেমনি পতন বা বিলুপ্তিও এক অবধারিত প্রক্রিয়া। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্যতা সূচনা থেকে ধারাবহিক বিকাশ লাভের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে পতনের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মেসোপটমীয় ও মিসরীয় সভ্যতার মতো ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে ওঠে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা। উৎপাদিত খাদ্য শস্য এবং ভোগ্যপণ্য যখন নিজেদের চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত হতে শুরু করে মানব সভ্যতা তখন নতুন একটি যুগে প্রবেশ করে। নব্য-প্রস্তর যুগে মানুষ নিজের উৎপাদিত বাড়তি দ্রব্যের সঙ্গে অন্যের উৎপাদিত বাড়তি দ্রব্যের অদল-বদল করতে গিয়ে বিনিময় প্রথা চালু করেছিল। একপর্যায়ে মানুষ ধীরে ধীরে উদ্বৃত্ত বা বাড়তি পণ্য বেচা কেনার প্রক্রিয়া শুরু করে। এভাবে ক্রমে নগর সভ্যতার উদ্ভব হয়। সরল গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক জীবনের বিপরীতে অপেক্ষাকৃত জটিল, বহুমুখী, উন্নত নগর জীবনের সূত্রপাত ঘটে তখন। দক্ষিণ এশিয়ায় এই সভ্যতার সবচাইতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, চানহুদারো, সুরকোতাদা, এবং কালিবঙ্গান। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো সিন্ধু নদের সুফলগুলোকে উপজীব্য করেই আজ থেকে ৪৫০০-৪০০০ বছর আগে নগর-জীবনের লক্ষণযুক্ত হরপ্পা সভ্যতার যাত্রা শুরু হলেও তা পরিণত হয়ে ওঠে ৩৬০০ বছর আগে।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের ধাতু, স্বল্প দামের পাথরসহ বিভিন্ন ধরনের জিনিস হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলোতে স্থলপথ, নদীপথ ও সমুদ্রপথে আনা হতো। এই বাণিজ্যের যোগাযোগ হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি ও বিকাশে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

চলো সুন্দর নগর গড়ি:

দেখো তাহলে কত বছর আগের হরপ্পা সভ্যতাতে মানুষ কিন্তু এলোমেলোভাবে তাদের নগরকে গড়ে তোলেনি। তাদের নগর নির্মাণ ছিল পরিকল্পিত। আচ্ছা তুমি যেখানে থাকো সেই শহর/ গ্রামকে আরও সুন্দর এবং পরিকল্পিতভাবে যদি গড়ে তুলতে চাও তাহলে সেখানের কী কী পরিবর্তন আনতে চাও তার একটি তালিকা তৈরি করো এবং সেই তালিকা অনুযায়ী মাটি/ ককশিট/ কাগজ ব্যবহার করে একটা মডেল তৈরি করে বন্ধুরা মিলে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করো।

মোহেনজোদারো নগরটি তখন দেখতে কেমন ছিল? বিশ্লেষণ ও কল্পনা করে তৈরি করা হয়েছে এই চিত্র।

মোহেনজোদারো এখন দেখতে কেমন? প্রত্নতাত্ত্বিক খননে মোহেনজোদারোর যে ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে তার কিছুটা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে।

দাবা খেলার বোর্ডের সাদা-কালো চৌকো ঘরের মতন ঘর-বাড়ি ও রাস্তা তৈরি হতো। স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের একটি অংশের উপর থেকে তোলা ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে। নগর-পরিকল্পনায় ঘরবাড়ি, রাস্তা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা খুব যত্ন করে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একটা সময় এই ব্যবস্থা নানা কারণে ব্যবস্থাপনার অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ কমে আসা, মহামারি, খাদ্যাভাবসহ বিভিন্ন সমস্যার প্রভাবে ধীরে ধীরে এসব নগর বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছিল।

হরপ্পা নগরের একটি তোরণ, ড্রেন ও ঘরবাড়ি কেমন দেখতে ছিল? কল্পনা করে আঁকা হরপ্পা নগরের একটি অংশের চিত্র।

সিন্ধু নদীর অববাহিকার সভ্যতা

সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব উচ্চভূমি, মরুভূমি ও সমুদ্রবেষ্টিত উর্বর কৃষিজমিতে হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। আফগানিস্তানেও সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া সিন্ধু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলো নদীতীরে আবিষ্কৃত হলেও বালাকোটের মতো প্রাচীন সমুদ্রসৈকতেও কতকগুলো কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে।আবার দ্বীপেও এই সভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ধোলাবিরার নাম করা যায়।

পাকিস্তানে হাকরা প্রণালি এবং ভারতের মরশুমি নদী ঘগ্গরের পরস্পর-প্রাবৃত প্রাচীন শুষ্ক নদীখাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধু সভ্যতার অনেক কেন্দ্র ঘগ্গর-হাকরা নদী অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রুপার, রাখিগড়ি, সোথি, কালিবঙ্গান ও গনওয়ারিওয়ালা। সিন্ধু নদীর অববাহিকা অতিক্রম করে হরপ্পা সভ্যতার বসতিগুলো এক বিশাল অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃতি ছিল ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম থেকে শুরু করে উত্তর ভারত পর্যন্ত। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত।

হরপ্পা সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে রাখিগড়ি, লোথাল, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, বালাকোট, নাগেশ্বর, ধোলাবিরা, গনেরিওয়ালা, ধোলাভিরা, কালিবঙ্গান, রাখিগড়ি, রুপার, লোথাল ইত্যাদি। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ১,০৫২টি প্রাচীন নগর ও বসতি অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

সিন্ধু নদ উপত্যকা

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় নদী উপত্যকার মধ্যে সিন্ধু নদী উপত্যকাটি একটি । এই উপত্যকার বিস্তার ১১৬৫০০০ বর্গ কিলোমিটার। সিন্ধু নদের পাঁচটি উপনদী আছে বিতস্তা (ঝিলাম), বিপাশা (বিয়াস), শতদ্রু (সাতলেজ), ইরাবতী (রাভি) ও চন্দ্রভাগা (চেনাব)। এই পাঁচ নদীর সমাহার থেকে পাঞ্জাব নামের উৎপত্তি হয়েছে। উপনদীগুলিসহ সিন্ধু উপত্যকার উত্তর অংশ, পাঞ্জাব অঞ্চল গঠন করে, যদিও সিন্ধু নিচের গতিপথ যা সিন্ধ নামে পরিচিত একটি বৃহৎ বদ্বীপে শেষ হয়।

উপরে আমরা অনেকগুলো সভ্যতার কথা এবং তাদের গড়ে ওঠার অঞ্চল সম্পর্কে জানলাম। তাহলে চলো এখন নিচের ছকটি উপরে দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে পূরণ করে ফেলি।

সভ্যতার নাম	গড়ে ওঠার স্থান

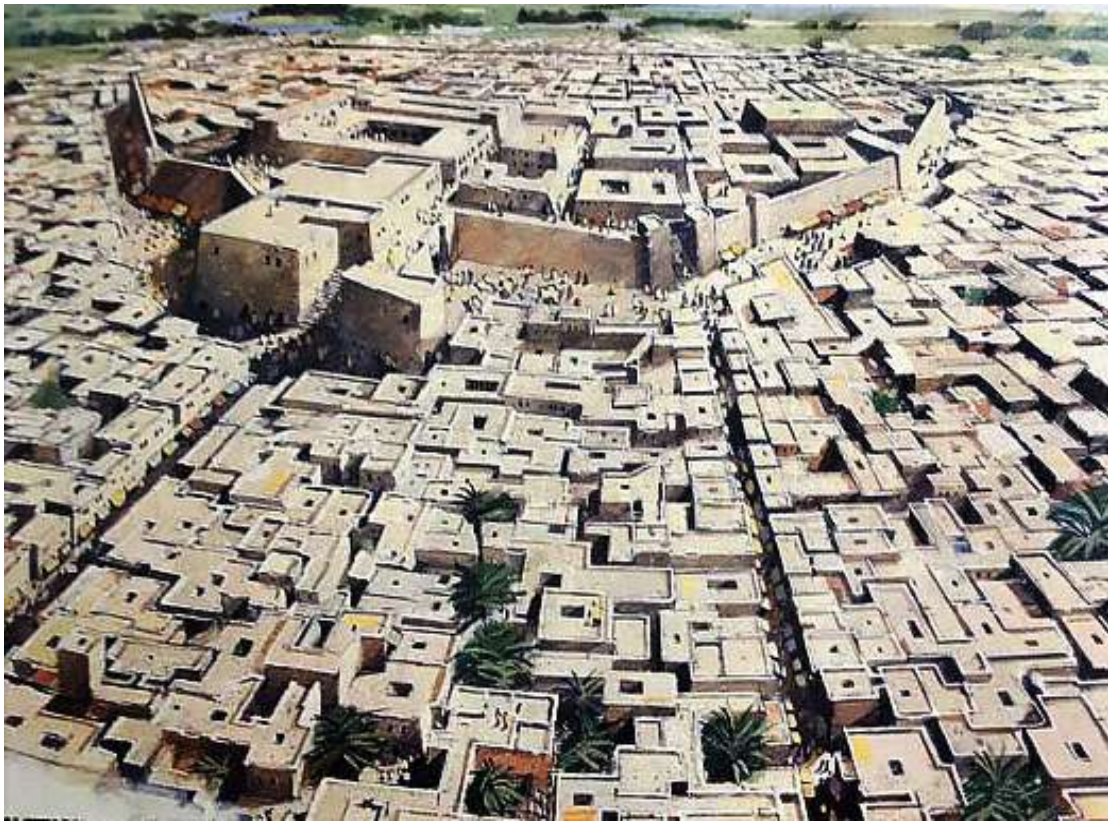

প্রাচীর ঘেরা মোহেনজোদারোর দুর্গ আর চারপাশের মানুষের বাড়িঘর ও রাস্তা আজ থেকে আনুমানিক ৪৫০০ থেকে ৪১০০ বছর আগে দেখতে অনেকটা এমন ছিল। তোমরা নিশ্চয়ই দাবা খেলার বোর্ড দেখেছ? নগরের রাস্তা ও ঘরবাড়ি এমনভাবে পরিকল্পনা করে তৈরি করা হয়েছিল যে, রাস্তাগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে সমকোণে যুক্ত ছিল। আর দাবার বোর্ডের যেমন চৌকো চৌকো বর্গ থাকে, ঠিক তেমনই ঘরবাড়িগুলো এক একেটা বর্গের মধ্যে তৈরি করা হতো।

অন্যান্য বসতি: বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র, শিল্প উৎপাদন, গ্রামীণ বসতি, মানুষের পরিচয়

সিন্ধু সভ্যতায় এক অভিজাত ও উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন নগরাঞ্চলীয় সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শহরগুলোই ছিল এই অঞ্চলের প্রাচীনতম নগরব্যবস্থা। নগর পরিকল্পনার উচ্চমান দেখে অনুমিত হয় নগরোন্নয়ন পরিকল্পনায় সম্পর্কে এই অঞ্চলের মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং এখানে একটি দক্ষ পৌর সরকারেরও অস্তিত্ব ছিল। এই সরকারব্যবস্থায় স্বাস্থ্যসচেতনতা যেমন গুরুত্ব পেতো, তেমনি নাগরিকদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও নজর রাখা হতো। হরপ্পা সভ্যতার একই সঙ্গে নগর, বাণিজ্য কেন্দ্র ও গ্রামীণ বসতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হরপ্পার সভ্যতার নিদর্শন, কাঁচামাল, ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যকেন্দ্র ও বাণিজ্যপথ চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাণিজ্য কেন্দ্র:

হরপ্পা সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল বাণিজ্য। হরপ্পা সভ্যতার যেমন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল তেমনি বহিঃবাণিজ্যও ছিল। বহিঃবাণিজ্যের মধ্যে মেসোপটেমীয়া, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, তুর্কমেনিস্তানের খার্তুজ, বর্তমান ইরানের হিশার, সুসা, মাকরান উপকূল ও ওমান। অন্তর্বাণিজ্যের মধ্যে ছিল বেলুস্তান, সিন্ধু, রাজস্থান, চোলিস্থান, পাঞ্জাব ও গুজরাট।

স্থল ও জল উভয় পথেই বাণিজ্য হতো। ধারণা করা হয়, স্থলপথে গরুর গাড়ি ও জল পথে নৌকা ও সাম্পান মাধ্যমে বাণিজ্য করা হতো। সিন্ধু সভ্যতার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লোথাল, ধোলাভিরা, সুরকোটাডা, দেশালপুর, নাগেশ্বর, রংপুর, এই বন্দরগুলো দ্বারা হরপ্পা সভ্যতার মানুষ সুমেরীয় , মিসর, পারস্য উপকূল অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য করতো।

কেমন ছিল হরপ্পা সভ্যতার নগরের আশপাশে থাকা কোনো বসতি? বাড়িঘর, চাষাবাদ, নৌকায় করে যাতায়াত? হরপ্পা সভ্যতার বসতি ও নানা ধরনের কাজের একটি কাল্পনিক চিত্র।

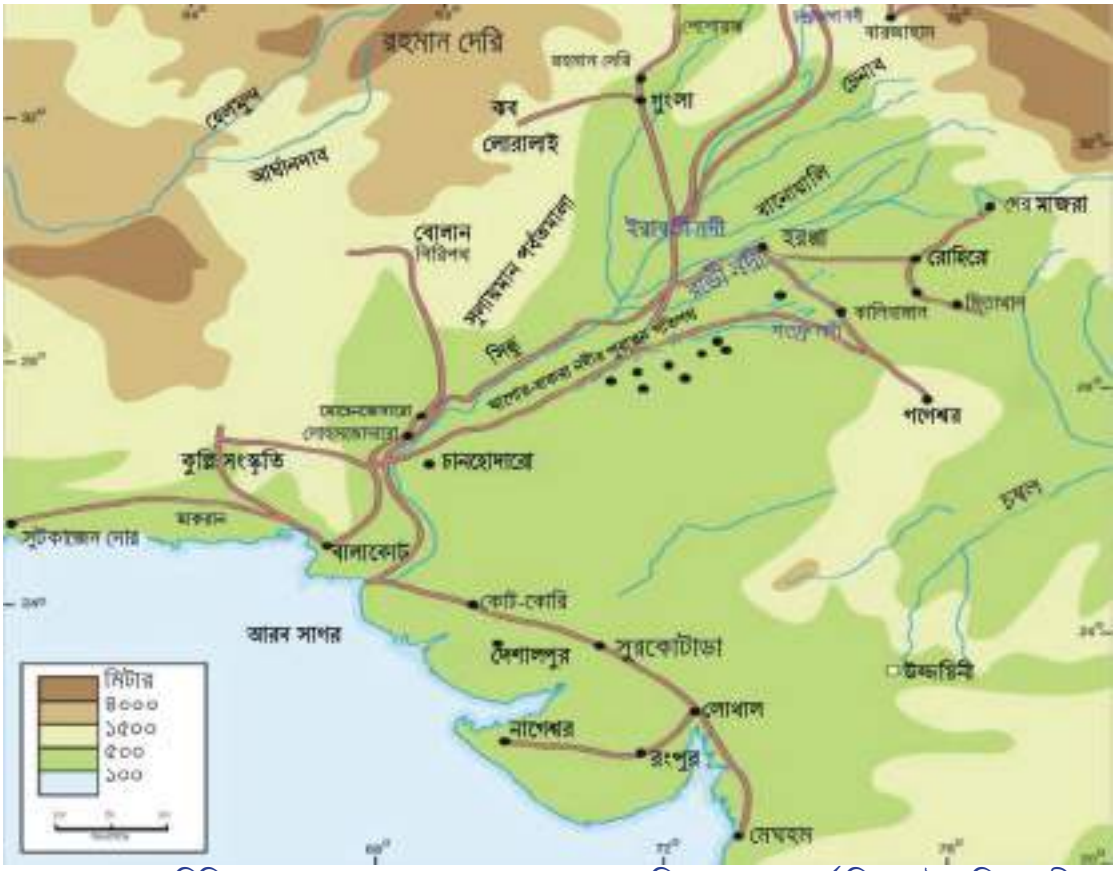

হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগরগুলোর পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বাণিজ্য নদীপথ ও স্থলপথে চলতো'। এমন যোগাযোগ পথের মানচিত্র।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের আলোকে ধারণা করা হয়, এই অঞ্চলে উন্নত নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আধুনিক নগরসভ্যতার মতো সেখানে পরিকল্পিত বসবাসের পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনেও পরিকল্পনার ছাপ ফুটে ওঠে। হরপ্পার উদ্ভব ও বিকাশের সময়কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথাক্রমে:

প্রাক হরপ্পা পর্ব

(৩৫০০ -২৬০০ প্রাক সাধারণ অব্দ)

পরিণত হরপ্পা পর্ব

(২৬০০-১৯০০ প্রাক সাধারণ অব্দ)

হরপ্পা পরবর্তী পর্ব

(১৯০০ / ১৭০০ প্রাক সাধারণ অব্দ থেকে পরবর্তী সময়কাল)

প্রাক-হরপ্পীয় সময়

নিকটবর্তী ইরাবতী নদীর নামে নামাঙ্কিত আদি হরপ্পা ইরাবতী পর্বের সময়কাল ৩৩০০ প্রাক সাধারণ অব্দ থেকে ২৮০০ প্রাক সাধারণ অব্দ। এটি পশ্চিমে হাকরা-ঘগ্গর নদী উপত্যকার হাকরা পর্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

পাকিস্তানের রেহমান ধেরি ও আমরিতে পূর্ণবর্ধিত পর্বের প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। কোট দিজি (হরপ্পা দুই) এমন একটি যুগের প্রতিনিধি যা পূর্ণবর্ধিত যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। এই স্তরে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের একটি প্রধান কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল এবং নাগরিক জীবনযাত্রার মানও ক্রমশ উন্নত হচ্ছিল। এই শহরের আরও একটি শহর ভারতে হাকরা নদীর তীরে কালিবঙ্গানে পাওয়া গেছে।

অন্যান্য আঞ্চলিক সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। লাপিস লাজুলি ও অন্যান্য রত্ন প্রস্তুতকারক উপাদান দূর থেকে আমদানি করা হতো। গ্রামবাসীরা এই সময় মটর, তিল, খেজুর ও তুলার চাষ করত। এই সময় মহিষ পোষ মানানো শুরু হয়। ২৬০০ প্রাক সাধারণ অব্দ নাগাদ হরপ্পা বৃহৎ এক নগরকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময়কাল থেকেই পূর্ণবর্ধিত হরপ্পা সভ্যতার সূচনা।

পরিণত হরপ্পীয় সময়

২৬০০ প্রাক সাধারণ অব্দ নাগাদ আদি হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা একাধিক বৃহৎ নগর কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। এই ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নগর হল আধুনিক পাকিস্তানের হরপ্পা, গনেরিওয়ালা, মোহেনজোদারো এবং ভারতের ধোলাভিরা, কালিবঙ্গান, রাখিগড়ি, রুপার, লোথাল ইত্যাদি। সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির অববাহিকায় মোট ১,০৫২টি প্রাচীন নগর ও বসতি অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্যাবলি

নগর পরিকল্পনা: হরপ্পা ও মোহেনজোদারোর নগরসমূহের গঠনশৈলী দেখে ধারণা করা হয় যে এই সভ্যতার জনগোষ্ঠী গ্রামীণ জীবন পরিত্যাগ করে সুসংগঠিত নগরের পত্তন ঘটিয়েছিল। প্রাচীন পৃথিবীর প্রাচীনতম নগর পরিকল্পনার প্রকাশ ঘটেছিল হরপ্পা-মোহেনজোদারোর নগরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে।

ক. রাস্তা:

দুই নগরের সব রাস্তাই ছিল সোজা। প্রধান সড়ক ৩৫ ফুট চওড়া ছিল। সবচেয়ে অপরিসর রাস্তা ছিল ১০ ফুট প্রশস্ত। ছোট ছোট গলিপথ ছিল ৫ ফুট চওড়া। বিভিন্ন ধরনের রাস্তার এই মাপ তারা বজায় রাখতো।

খ. পানি সরবরাহ:

হরপ্পা ও মোহেনজোদারো শহরের শাসকবৃন্দ নগরবাসীদের পানি সরবরাহের জন্য পথের ধারে কূপ খনন করত। অনেক বাড়ির উঠোনের সামনেও কূপ ছিল।

গ. পয়ঃপ্রণালি:

নগর পরিকল্পনাকারী নগরজীবনকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মাটির নিচে সুরক্ষিত পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে সর্বসাধারণের এবং ব্যক্তিগত পয়ঃপ্রণালির অস্তিত্ব ছিল। নগরায়ণের এই আধুনিক ধারণা অন্য কোনো প্রাচীন সভ্যতায় দেখা যায়নি। এছাড়া নগরের প্রতিটি বাড়িতে একটি করে স্নানাগার এবং ময়লা পানি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা ছিল। এই ড্রেনগুলো প্রধান পয়ঃপ্রণালির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ডাস্টবিনের ব্যবস্থা:

হরপ্পা ও মোহেনজোদারো নগরের কর্তৃপক্ষ রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে পথের পাশে ডাস্টবিন রাখার ব্যবস্থা করতেন।

হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া মানববসতির একাংশ

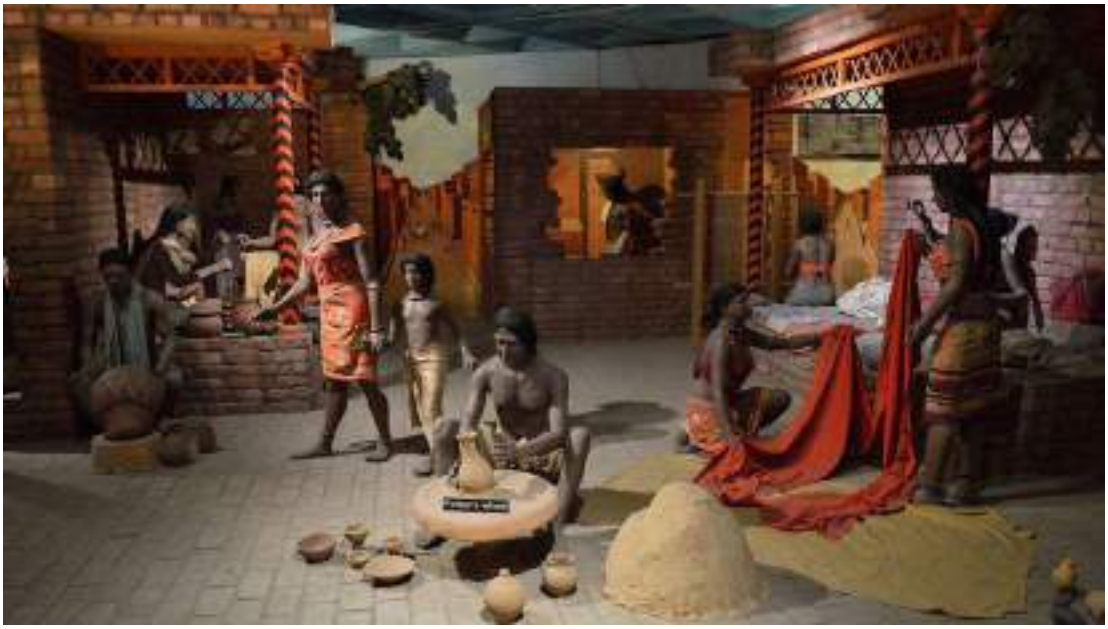

হরপ্পা সভ্যতার কোনো একটি নগরের দোকানপাট, মৃৎপাত্র তৈরি, ও চিত্র তৈরি করা কাপড়

মোহেনজোদারো নগরের একটি রাস্তা।

মোহেনজোদারোর নগরের বিখ্যাত বৃহৎ স্নানাগার

পরিকল্পিত পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালি

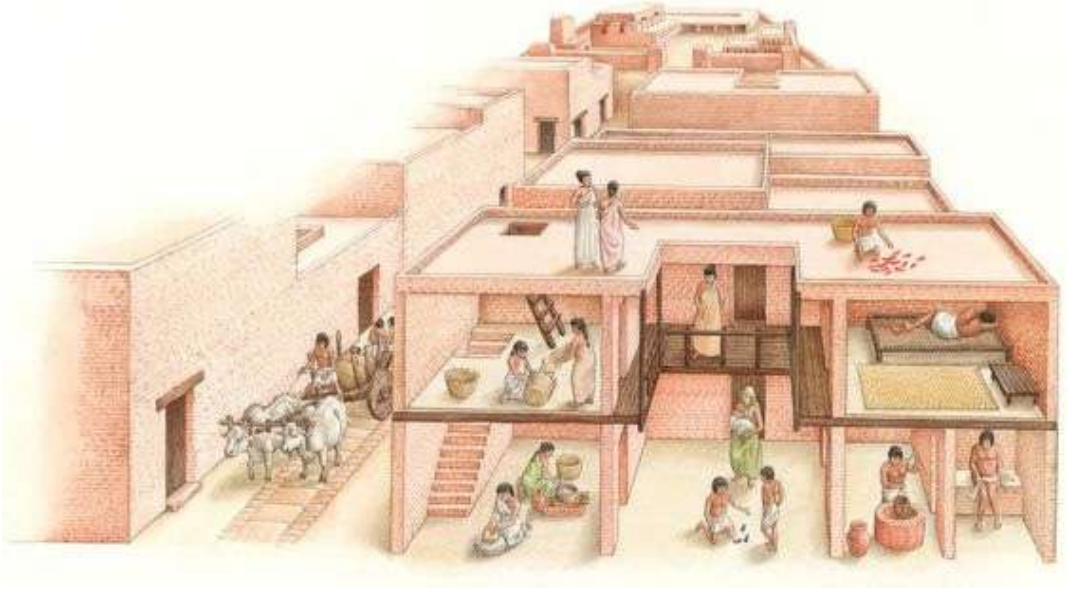

মহেনজোদারোর রাস্তা আর রাস্তার পাশের ঘরবাড়ি। খননে খুঁজে পাওয়া স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে কাল্পনিক চিত্র

পরিমাপ পদ্ধতি :

ক্রয় ও বিক্রয়ে দ্রব্যাদির সঠিক পরিমাপের স্বার্থে হরপ্পা ও মহেনজোদারো নগরের মানুষ ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল।

বাটখারা:

দ্রব্যাদি ওজনের জন্য নগরের অধিবাসীরা বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করত। সবচেয়ে ক্ষুদ্র বাটখারার ওজন ছিল ০.৮৭৫ গ্রাম এবং বৃহৎ বাটখারার ওজন ছিল ১০.৯৭০ গ্রাম।

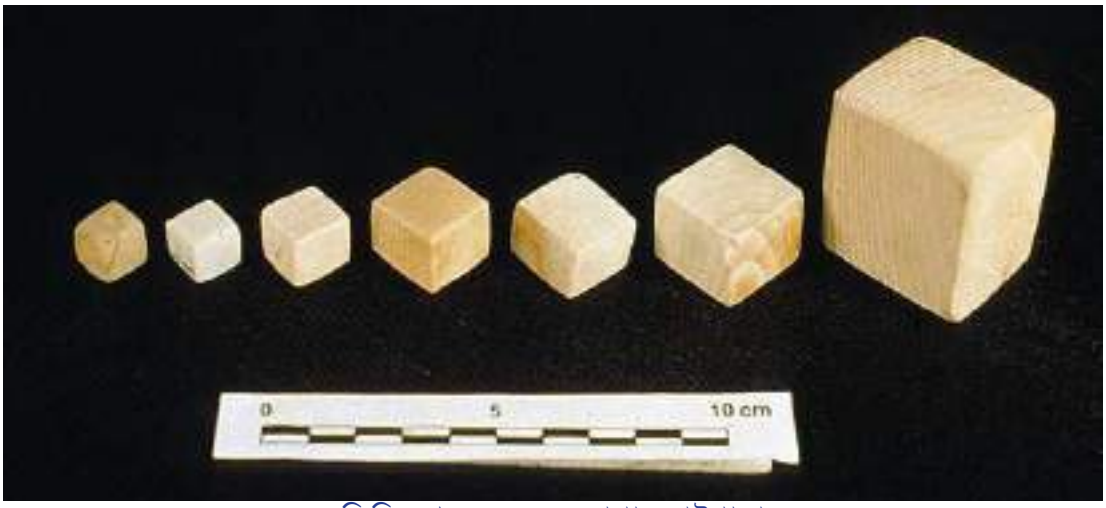

বিভিন্ন ধরনের ওজন মাপার বাটখারা

আমরা তো বিভিন্ন ছবি ও তথ্যের সাহায্যে সিন্ধু ও হরপ্পা সভ্যতার নানা দিক জানলাম। এখন চলো একটা আমরা মজার কাজ করি। যেকোনো একটি বিষয় যা এই সভ্যতাগুলোকে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছিল সেরকম একটি বিষয় নিয়ে পোস্টার বানিয়ে বন্ধুরা মিলে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করি।

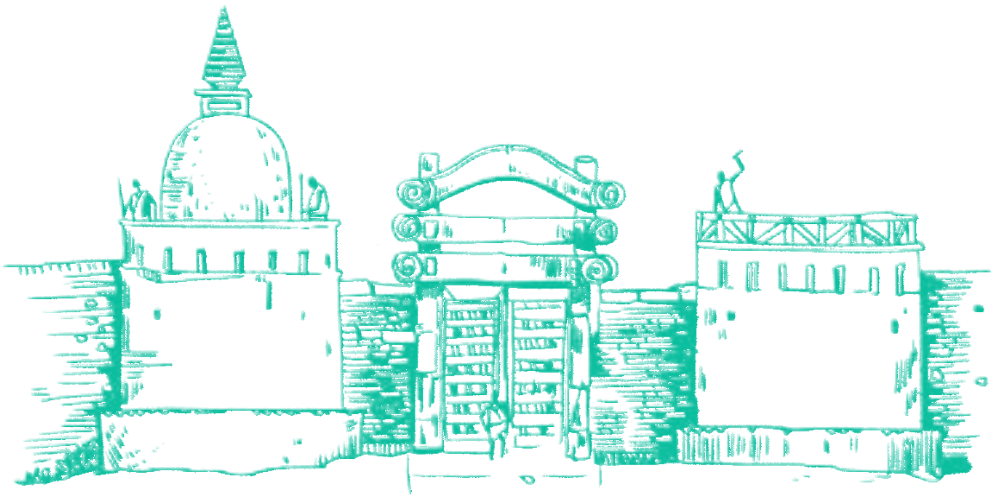

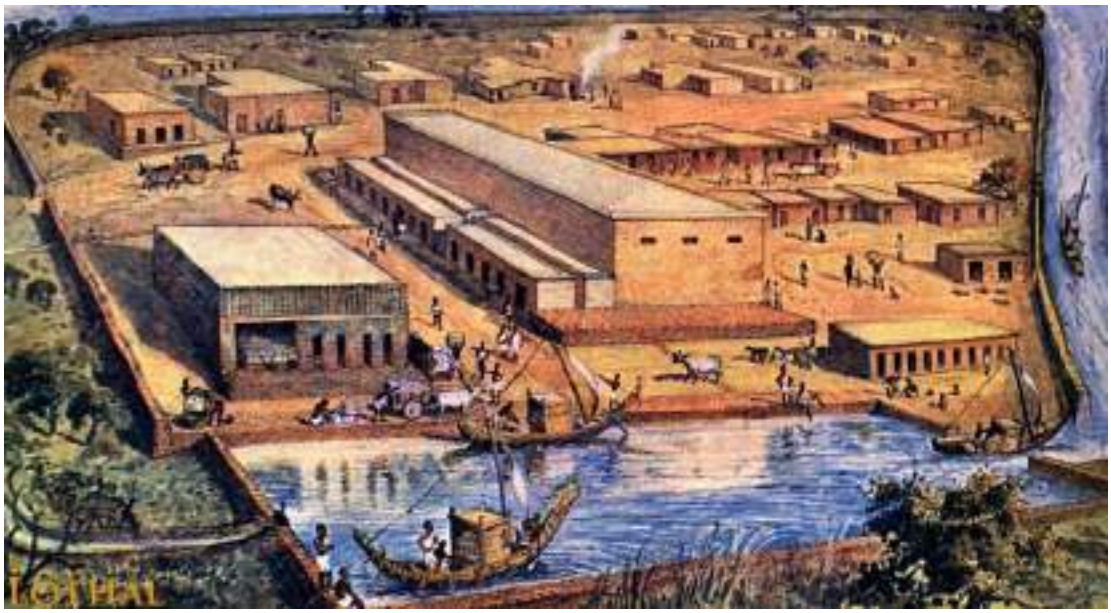

আরব সাগরের তীরে লোথাল ছিল হরপ্পা সভ্যতার আরেকটা নগর। এই নগরটি ছিল একটি সমুদ্র বন্দর। শিল্পীর চোখে সেই সময়ের লোথাল।

নদীর/নদের গতিপথ পরিবর্তন

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে নদী যদি তার স্বাভাবিক চলার পথ পরিবর্তন করে, তখন সেই অবস্থাকে নদীর গতিপথ পরিবর্তন বলা হয়।

ধোলাবিরা ছিল আরেকটি নগরকেন্দ্র। সেটি দেখতে কেমন ছিল? প্রাচীর ঘেরা সুরক্ষিত অংশ এখানে দেখানো হয়েছে।

শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও অলংকার শিল্পের দক্ষতা হরপ্পা ও মোহেনজোদারোর সমৃদ্ধির নির্দেশ করে। সিন্ধু সভ্যতায় পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি প্রচুর ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে। তাদের পাথুরে ভাস্কর্যের কয়েকটি উদাহরণ এখানে সংযোজিত হলো। এতে তাদের ভাস্কর্য-শিল্পে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন : চুনাপাথরের মহেনজোদারোতে পাওয়া গেছে। এটি ছিল নরম পাথরের তৈরি। দাড়ি, চোখ, নাক, কান প্রভৃতি নির্মাণে ভাস্করগণ বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন।

চুনাপাথরের মূর্তি [প্রধান পুরোহিত/শাসক?]

হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের ব্যবহৃত পোড়ামাটির, স্বল্পমূল্যের পুঁতি, ধাতুর হাতের চুরি, গলার হারসহ নানা ধরনের অলংকার

এছাড়া সিন্ধু সভ্যতার স্বর্ণকারগণ অপূর্ব নকশায় অলংকার তৈরিতে দক্ষ ছিল। তারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ও ব্রোঞ্জের অলংকার তৈরি করত। তাদের তৈরি অলংকারের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, নেকলেস, কানের দুল, বাজুবন্ধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হরপ্পা ও মোহেনজোদারোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটিতে তৈরি খেলনা জীবজন্তুর মূর্তি ও চাকতি

মোহেনজোদারোতে বেশ কিছু ব্রোঞ্জের পশু-মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে শিল্পমানের দিক থেকে উৎকৃষ্ট হলো ষাঁড় ও ছাগলের মূর্তি। হরপ্পা ও মোহেনজোদারোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির (Terracotta) ভাস্কর্যও এ সভ্যতার শিল্প-উৎকর্ষের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। পোড়ামাটির উপর ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

হরপ্পা ও মোহেনজোদারোতে পোড়ামাটিতে তৈরি যেসব জীবজন্তুর মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে গরু, উদ্ধত ষাঁড়, মহিষ, কুকুর, শূকর, হাতি, বানর ও পাখি উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত শিল্প মানের দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত ছিল।

হরপ্পায় মাটির তৈরি খেলনা গরুর গাড়ি

একটি নৌকার অনুকৃতি। পোড়ামাটিসতে তৈরি এই ছোট নৌকার আকার ও ধরন দেখে সেই সময়ের হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগর ও বসতির মধ্যে নদীপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত নৌকা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

সামাজিক শ্রেণি:

মোহেনজোদারোর খননকাজের ফলে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, এখানে বসবাসকারী মানুষ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। ১. শিক্ষিত শ্রেণি, ২. যোদ্ধা, ৩. ব্যবসায়ী ও কারিগর এবং ৪. শ্রমজীবী শ্রেণি। শিক্ষিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী এবং জাদুকর গোষ্ঠী।

খাদ্য :

নগরবাসীর খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন পশুর মাংস অন্তর্ভুক্ত ছিল; যেমন, গরু, ছাগল, শূকর, হাঁস, মুরগি, কচ্ছপ ইত্যাদি। তবে প্রধান খাদ্য ছিল গম। যব এবং খেজুরও তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তারা খাবার হিসেবে দুধও গ্রহণ করত। যদিও তেমন প্রমাণ মেলে না তবুও মনে হয় সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা সবজি এবং ফল খেতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা:

সিন্ধু সভ্যতার জনগণ বিস্তৃত অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে সিন্ধু উপত্যকায় গড়ে ওঠা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষি:

প্রধানত সিন্ধু সভ্যতার জনগণ ছিল কৃষিজীবী। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয় এই সভ্যতার মূল উৎপাদিত শস্য ছিল গম, বার্লি এবং তুলা। কৃষিকাজে ষাঁড় ব্যবহার করা হতো।

শিল্প:

সিন্ধু সভ্যতার কারিগররা বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করত। ধাতব শিল্প হিসেবে তামা ও ব্রোঞ্জের বিভিন্ন অস্ত্র ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি হতো। তবে সিন্ধু সভ্যতায় লোহা ব্যবহারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সিন্ধু সভ্যতায় বয়ন-শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল। তারা তুলা ও পশম দিয়ে কাপড় বুনতে পারত। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন নির্মাণকাজে কাঁচা এবং আগুনে পোড়ানো উভয় ধরনের ইটই ব্যবহার করা হতো। হরপ্পা ও মোহেনজোদারোতে অনেক ইটের ভাটা

আরেক ধরনের নৌকার মডেল বা অনুকৃতি। এমন মডেল থেকে হরপ্পা সভ্যতার বসবাসকারীদের জলপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত নৌকা ও পরিবহন সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

হরপ্পায় মাটির তৈরি খেলনা গরুর গাড়ি

সিন্ধু সভ্যতার করিগরগণ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প দ্রব্য তৈরি করত। সেগুলোর মধ্যে ছিল প্রচুর খেলনা। হরপ্পায় মাটির তৈরি দুই চাকার ষাঁড়ের খেলনা-গাড়ি পাওয়া গেছে । এছাড়াও পোড়ামাটির ও তামার এক্কাগাড়ি, পাখি প্রভৃতি নিদর্শনের কথাও উল্লেখ করা যায়। অলংকরণ শোভিত গোলাকৃতির মৃৎপাত্র সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম কারিগরি দক্ষতার পরিচায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়।

গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা হয়। এসব ছাড়া এ সভ্যতায় হাতির দাঁতের চিরুনি, হাতির দাঁতের সুচ, কাঠের হাতলবিশিষ্ট তামা ও ব্রোঞ্জের আয়না, মৃৎপাত্র, সিল প্রভৃতি তৈরির ক্ষুদ্র শিল্পও গড়ে উঠেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য:

সিন্ধু সভ্যতার কারিগরগণ পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করত। এসবের চাহিদা ভারতের বিভিন্ন অংশ ছাড়াও বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে নানা দেশের সঙ্গে এখনকার মানুষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতের উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট ও কাথিওয়ারের সাথে সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ মেলে এসব অঞ্চলে প্রাপ্ত ধাতব দ্রব্য, মৃৎপাত্র, অলংকার প্রভৃতি থেকে বহিঃবাণিজ্য হিসেবে পারস্য, আফগানিস্তান, মেসোপটেমিয়া ও মিসরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

চারকোণাকৃতির সিল মোহর

লিখন পদ্ধতি:

১৯২৫ সাধারণ অব্দের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার ২৫০০টি সিলে চিত্রধর্মী লিপি পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভাষাবিদগণ এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেননি।

মৃৎপাত্র:

হরপ্পা ও মোহেনজোদারোতে কুমোরের চাকায় বিভিন্ন আকৃতির মাটির পাত্র তৈরি হতো। অলংকরণ শোভিত এ সমস্ত মৃৎপাত্র ব্যবহার করা হতো পানি, শস্য, লবণ প্রভৃতি সংরক্ষণের কাজে। লাল, কালো প্রভৃতি রঙের ব্যবহার করে মৃৎপাত্রগুলোকে উজ্জ্বল করা হতো।

বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র। আকার দেখে তোমরা ধারণা করতে পারো এগুলোর ব্যবহারের ধরন?

কবর:

হরপ্পা সভ্যতায় মৃতদেহকে কবর দেওয়ার প্রচলন ছিল। হরপ্যা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নস্থান থেকে বিভিন্ন দ্রব্যাদিসহ কবর পাওয়া গেছে। হরপ্পা নগরের একটি কবরস্থানে অনেক কবর ও কঙ্কাল পাওয়া গেছে।

হরপ্পা সভ্যতার বসবাসকারী মৃতদেহ নানা ধরনের বস্তুসহ কবর দিত। এমন কঙ্কালসহ এমন কবর অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন কঙ্কাল বিশ্লেষণ করেই বিজ্ঞানীরা ওই সভ্যতার অধিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গড়ন সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছেন। হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন দেহাবশেষের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে এখানকার অধিবাসী স্থানীয় ও বর্তমান ইরান অঞ্চল থেকে আসা মানুষদের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছিল। তাদের সঙ্গে বর্তমান দক্ষিণ ভারতীয়দের মিল বেশি। ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসী দ্রাবিড়ীয় ভাষার কোনো একটি আদি রূপে কথা বলতেন। এদের প্রোটো-দ্রাবিড়ীয় প্রকারের ভাষা বলা হয়। অন্যদিকে, তোমরা আগেই পড়েছ যে, স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দলে মানুষদের আসা শুরু হয় হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয় শুরুর পরে।

হরপ্পা সভ্যতায় বাণিজ্য,ও বিভিন্ন নগরের পরিচয় নির্ধারণকারী বিভিন্ন ধরনের সীলমোহর। এই সিলমোহর ও সিলমোহরে ব্যবহৃত হরফ বা চিত্রলিপিগুলো এখনো প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের কাছে রহস্যময় রয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে।

হরপ্পা সভ্যতার ক্রমিক অবনতি ও কারণ

সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বা বস্তুর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান, হরপ্পা সভ্যতা আনুমানিক ২৩০০ থেকে ১৭৫০ প্রাক সাধারন অব্দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল । হরপ্পা সভ্যতা ছিল এক বিশাল প্রাণবন্ত সভ্যতা এবং এই প্রাণবন্ত সভ্যতা কী কারণে বিলুপ্ত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। দীর্ঘ ৬০০ বছর উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত অস্তিত্বের পর আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দের কিছুকাল পরে এই সভ্যতার অবসান ঘটেছিল, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত । এই সভ্যতার ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদ, ভূতত্ত্ববিদ, আবহাওয়া তত্ত্ববিদ এবং বিভিন্ন ইতিহাসবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ প্রকাশ করেছেন । এঁরা সকলেই বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । তবে আজ পর্যন্ত এমন কোনো তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি যার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, কোনো একটি বিশেষ কারণে এই সুমহান সভ্যতার পতন ঘটেছিল । হরপ্পা সভ্যতার বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের কয়েকটি মৌলিক বিষয় মনে রাখতে হবে । সিন্ধু উপত্যকা এবং তার বাইরে যে বিশাল এলাকাজুড়ে এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল, তা কিন্তু সমস্ত এলাকায় একই সঙ্গে বিলুপ্ত হয়নি । হরপ্পা ও মোহেনজোদারোর বিলুপ্তির এক বা দেড়শ বছর পরেও সুরকোটরা প্রভৃতি অঞ্চলে এই সভ্যতা টিকে ছিল। এর পরেও গুজরাট, রাজস্থান ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ভঙ্গুর অবস্থাতেও এই সভ্যতার অস্তিত্ব বজায় ছিল। এই সভ্যতার সকল কেন্দ্রগুলোর পতনের পশ্চাতে একই কারণ বা প্রেক্ষাপট ছিল না। দু-একটি নগর বা কেন্দ্রের পতনের কারণ এক হলেও সর্বত্র তা সমান ছিল না । আকস্মিকভাবে হঠাৎ এক দিনে এই সভ্যতার পতন হয়নি । দীর্ঘদিন ধরে ক্রমিক অবক্ষয়ের ফলে সভ্যতাটি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে এবং তার পরেই আসে চরম বিপর্যয়, যা সভ্যতাটির বিলুপ্তি ঘটায় ।

সিন্ধু ও হরপ্পা সভ্যতার কত অজানা বিষয় সম্পর্কে জানলাম তাই না! চলো তাহলে নিচের ছকে এসব বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি জিনিসের কিছু ছবি এঁকে ফেলি।

বিষয়	ছবি
অলংকার	
খেলনা	
সিল	
মৃৎপাত্র	

হরপ্পা সভ্যতার পতনের সম্ভাব্য কারণগুলোকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ১. প্রাকৃতিক কারণ; ২. অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়; ৩. অন্যান্য কারণ ।

১. প্রাকৃতিক কারণ : হরপ্পা সভ্যতার পতনের জন্য অনেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণগুলোকে দায়ী করে থাকেন । এই প্রাকৃতিক কারণগুলো হলো ক. জলবায়ুর পরিবর্তন, খ. মরুভূমির প্রসার, গ. সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তন, ঘ, ভূমিকম্প, ঙ. বন্যা, চ. খরা।

২. অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় :অনেকে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংস বা পতনের জন্য এই সভ্যতার অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের বিষয়টিকেই দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, বিভিন্ন নগরের মধ্যের যোগাযোগ ও বিনিময়ের সম্পর্কের অব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়া হরপ্পা সভ্যতার পতনের পথ প্রস্তুত করেছিল। এসবের মধ্যে রয়েছে, হরপ্পা সভ্যতার নিচের স্তরগুলোতে যে উন্নত নাগরিক সভ্যতার ছাপ পাওয়া যায় তার তুলনায় ওপরের স্তরগুলোতে নাগরিক জীবনের অবক্ষয়ের চিত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে চোখে পড়ে। তুলনা করলে দেখা যায় বাড়িগুলি রাস্তা দখল করে নিচ্ছে, গলিপথগুলো ক্রমে সরু হয়ে আসছে, নর্দমাগুলি অপরিষ্কার থেকে যাচ্ছে, বড়ো অট্টালিকাগুলি পৃথক করে ছোটো ছোটো খুপরি তৈরি হচ্ছে, কৃষি ও বাণিজ্যের অবনতি ঘটছে এবং প্রযুক্তিতে যেমন মৃৎপাত্র তৈরিতে মানের অবনমন ঘটেছে ।

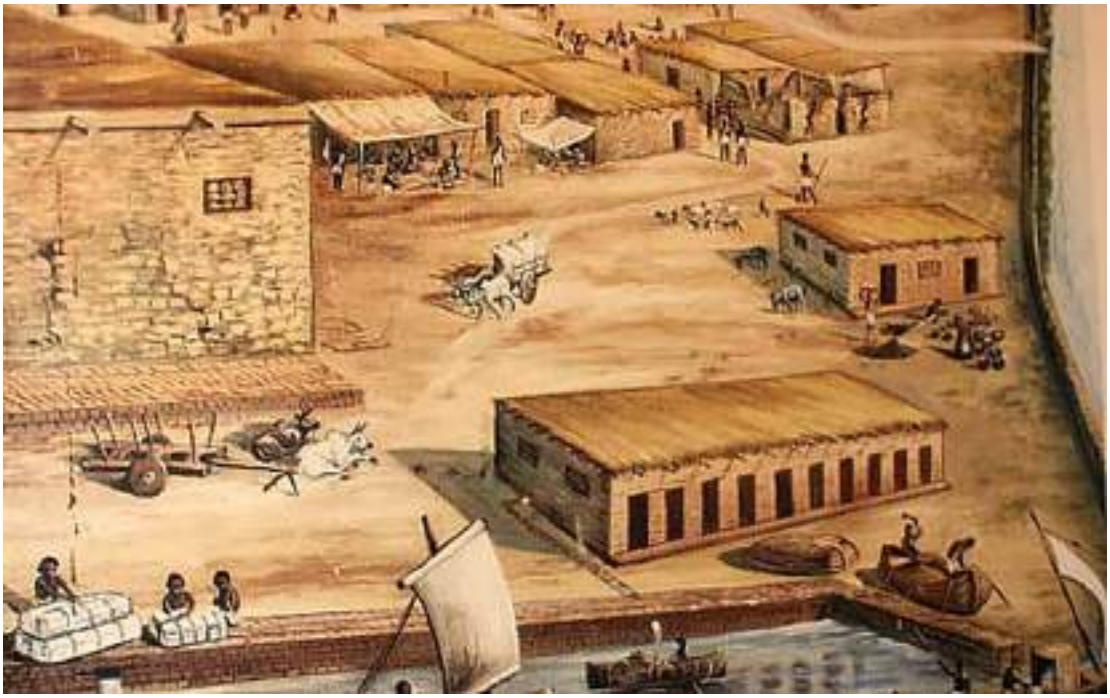

কোনো একটি নগরের বাজার, জলপথ, পরিবহনসহ একটি সাধারণ দৃশ্য ইতিহাসবিদগণ কল্পনা করে এঁকেছেন।

হরপ্পার পরে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন মানুষ, সমাজ ও বসতি :

যমুনা এবং শতদ্রু বা শতলুজ নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় প্রায় ৫৬৩টি হরপ্পা-পরবর্তী জনবসতি চিহ্নিত করা হয়েছে। বেশির ভাগ বসতি ছোট এবং ৫ হেক্টরের নিচে। এর মধ্যে সেমেটারি-এইচ সংস্কৃতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের পাঞ্জাব অঞ্চলের একটি ব্রোঞ্জ যুগের সংস্কৃতি। এটি ছিল হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যায়ের একটি আঞ্চলিক রূপ। এছাড়া হিন্দুকুশ পবর্তের পাশে পেশোয়ার ও চিত্রালের মাঝে একটি স্থানে

অনেকগুলো কবরের সন্ধান পাওয়া যায় যা গান্ধার গ্রেভ সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে। গাঙ্গেয় অববাহিকায় ব্রোঞ্জ যুগের গৈরিক রঙের মৃৎশিল্পের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। দক্ষিণভাগে লোহার প্রচলন হয়। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি স্মারক স্থাপনা পাওয়া যায়। ওই স্থাপনাগুলো মেগলিথ নামে পরচিতি। এছাড়া, পশ্চিম ভারতের কিংবা পূর্ব ভারতের বিহার ও পশ্চিম বাংলায় লাল ও কালো রঙের মৃৎপাত্র আর তামার ব্যবহারকারী মানব বসতির প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য ও উত্তর ভারতেও চিত্রিত ধূসর মৃতপাত্রের এবং লোহার ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। হরপ্পা সভ্যতার অবনমনের পরে আবারও নগর সভ্যতা গড়ে উঠতে প্রায়১৫০০-১৮০০ বছর সময় লাগলেও এই সময়ে বিভিন্ন বসতি পাওয়া গেছে যেগুলো প্রাচীর ঘেরা, বৃহদাকৃতির, এবং কৃষি-বাণিজ্য-লোহার ব্যবহারনির্ভর। লৌহযুগের সূত্রপাত সে হিসেবে ১২০০-১০০০ সাধারণ পূর্বাব্দে শুরু হয়। তাই মনে করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই যে, হরপ্পা সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেছিল। উত্তর-পশ্চিমাংশে নগরগুলো পরিত্যক্ত হলেও বসতি অন্যভাবে টিকে ছিল। আর অন্যান্য অংশে মানুষজন প্রযুক্তি, কৃষিকাজ ও জীবনযাপনে পরিবর্তন আনছিল। এ সময় নগর ও রাষ্ট্র বিকশিত না হলেও নানা গোত্র, বংশধারা আর আঞ্চলিক সমষ্টি বিকশিত হচ্ছিল। বিশেষ করে, মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ ভারত উপমহাদেশে আগমন করছিল নতুন জীবন, নতুন ভাষা আর নতুন প্রযুক্তি নিয়ে। তাদের একটা বড় অংশ যাযাবর ও পশুপালক ছিল। হরপ্পা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানের মানুষের সঙ্গে এই মধ্য এশীয় মানুষদের সংমিশ্রণ ঘটছিল প্রায় এক হাজার বছর ধরে। এই মধ্য এশিয়ার মানুষদেরই আর্য নামে ডাকা হতো। তারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা আর বংশভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়েছিল। ঋগ্বেদসহ পরবর্তী সময়ে সংকলিত বেদ ও বেদ পরবর্তী নানা লিখিত উৎসের সৃষ্টি হয়েছিল এই আগমন, সংমিশ্রণ ও রূপান্তরের সময়েই।

বেদ

বেদ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ 'জ্ঞান'। এটি হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারটি খন্ডের সংকলন বলে বেদের আরেক নাম সংহিতা। বেদে অনেক সামাজিক বিধি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদির কথাও আছে। এজন্য বেদকে সমাজ, সাহিত্য রাজনীতি, অর্থনীতির এক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।